ঈশ্বরের সঙ্গে দুদণ্ড

কবিতাবলী

বন্ধু কোনখানে নেই

শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শ্রদ্ধাস্পদেষু

সব কবিতাগুলির জন্ম তারিখ মনে নেই বলে সর্বত্র উল্লেখ করা হয়নি এবং সেই কারণেই কবিতাগুলিকে রচনাকাল অনুযায়ী সজানো ব্যাপারটা নিতান্তই গৌণ মনে হলো।

যাঁদের ভালোবাসা আর দরদের স্পর্শে এ বই প্রকাশ সম্ভব হলো, নাম উল্লেখ করে তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের দুর্লভ প্রলোভনে পেয়ে বসেছিল কদিন ধরে, কিন্তু শুধু কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মধ্যে কোথায় যেন একটা স্থূল সম্পর্ক আর সমাপ্তির ইঙ্গিতের মধ্যে শস্তা খুসি করার প্রচ্ছন্ন মোহ আছে, তাই সে সব শ্রদ্ধাস্পদ ও বন্ধুদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানোর প্রলোভন সংবরণের জন্য স্বস্তি বোধ করছি।

শৈশব

তুমি আসলে বাতাস আবার বাজাবে নূপুর,
শুকনো পাতার শরীরে করতালি,
শুকনো ডালে যৌবন-উল্লাস—
তুমি আসলে ভাঙা বুকে আবার জোড়াতালি
দিতে পারব, তোমাকে খুলে আমার বুকে আসন
তোমার জন্য সুরক্ষিত গোপন এক সিঁড়ি
তুমি উঠতেপারবে সুনির্ভয়ে,
তোমার হাতেই আছে ঘরের চাবি,
আমি শুধু তোমার ঘরে ঢুকব আগলায়ে।

ইতিমধ্যে অনেক দেশ বাড়ি ঘুরে এলাম,
অনেক মাটি অনেক ঘর অনেক মন ছুঁলাম,
তোমার মত একটিও মন দেখতে পেলাম না।
তোমাকে আমি বহু ঋতুর সলাজ রঞ্জনে
দেখেছি, হাতে ছুঁয়েছি বুক ভরে, মনে মনে
বুঝেছি, শুধু মনের পাখি ছুঁতে পেলাম না।

তুমি এসো যখন খুশি, আমার ভালোবাসা,
আমি আবার স্নিগ্ধ হব তোমার হাসিমুখে।

সম্ভাষী

সে-ই যদি কয় আমি আবার
ফিরে এলাম, ফিরে এলাম ;
পুরনো দাবী, পুরনো ঘর
পুরনো ভালোবাসা,
পুরনো খেলা নতুন করে হবে ।
তবে ?
দূর করে তুই দিস না তারে
গহন অন্ধকারে
যায় যদি যাক
বুক ফেটে তোর দুঃখ অহংকারে

পুরনো ঢেউ পুরনো নদী
পুরনো সংসারে,
গভীর সংগোপনে
ভাসিয়ে দিস বুকের পাথরগুলি ;

অহংকারের ভস্ম দিয়ে
সাজিয়ে নিস তাকে ;
ভরিয়ে দিস দুচোখ অঞ্জনে ।
তারপরে তুই একলা ঘরে
চোখের জলে যাস রে মরে
হৃদয় রঞ্জনে ।

ছায়াছবি

খেজুরের বন পাতার ছাউনি মাটির দেয়াল
কেন ছাড়লাম, কী হলো খেয়াল ?
ঘুমন্ত নদী পাশফেরা বন চারকোণা মাঠ
পরিপাটী পথ ছায়াঢাকা ঘাট

সারারাত হাওয়া খোলা সারারাত ঘরের কপাট
—কেন ছাড়লাম ?

ভাটিয়ালি সুর ভরাজ্যোৎস্নায়
মাঝিদের নাও গাঙপার যায়,
—কেন ছাড়লাম ?
মন্দ ছিলো ?

ভোরে উঠে দেখা শিশু-সূর্যের একলাফে পার হওয়া চৌকাঠ।
ক্রমে বেলাবাড়া, খোঁড়া কাঠুরের জড়ো করা কাঠ।
এখানে সেখানে কেঁচো তুলে জড়ো ক'রেছে মাটি।
ধোপাদের বউ আদাড় বাদাড় কুড়িয়ে বাঁধছে পাতার আঁটি।

গামছার ফাঁদে জেলের ছেলেরা ধরছে মাছ।
কুমোরপাড়ায় রৌদ্রে শুকোয় মাটির ছাঁচ।
নদীর কিনারে বেলা দুপহরে গলিয়ে পিচ
নৌকো উল্টে মাঝিরা মাথায় উপর-নীচ।

হেলা বাঁশঝাড় আড়ালে বিছোনো বালুর চর।
দাওয়ায় ছেলেটা এক মনে ব'সে কড়া চেটে খায় দুধের সর।
বিকেলে বিকেলে কালোমেয়েটির জল নিতে আসা,
শূন্য কলসী, খোলা জানালায় তাকানো চোখের নির্বাক ভাষা।
কেন হারালাম এতো ছায়াছবি সুপুরির বন জামতলা গ্রাম।
আর তো পাব না তখন বুঝিনি কেন ছাড়লাম ?
মন্দ ছিলো ?

মনে মনে

অত কাছে নিয়োনা শরীর
হাওয়ারা উতলা আর কামনারা হয়নি অস্থির
এখনো সময় কাঁদে ফিরে এসো উতল নির্জনে
তাকে তুমি ভালোবাসো ঘরে এসে একা মনে মনে

মুখে তুমি নিয়ো না ও-মুখ,
ও-মুখে যৌবন-জ্বালা শরাহত হরিণী-অসুখ।
তার চেয়ে ভালোবাসো তাকে
ভালোবাসো সেই যন্ত্রণাকে
যে অন্ধ বাজায় শূণ্য হাড়ির পিছনে
বটের ছায়ায় নির্জনে ;
মূকের বেদনা কাঁদে দশটি আঙুলে
কখনো যেও না তাকে ভুলে।

ওর দুঃখ দূর হোক্ ভগবান মনে মনে বলো
আর,
তাকে ভেবে চিরকাল নক্ষত্রের মতো তুমি জ্বলো।

বৃষ্টির অপেক্ষায়

বৃষ্টির অপেক্ষামাত্র। কখন ঘুরবে বৃষ্টি দুয়ারে দুয়ারে,
তাকে নিয়ে যাত্রা হবে। শিয়রে শীতল হাত, সঙ্গে নিয়ে তাকে
ভালোবাসা তৃপ্ত হবে। বাতাসে শীতল জল, বুকে শাদা বিদ্যুতের জ্বালা,
তৃষিত দুহাতে তাকে তুলে দেব মদের পেয়ালা।

বৃষ্টির অপেক্ষামাত্র। ভিজে ভিজে যাব তার বাড়ী,
শরীরে মেখো না রঙ্, ভিজে-চোখে না চিনতেও পারি,
আবার খুঁজতে হবে, নগরের ঘরে ঘরে খুঁজে
অন্ধ হব গৈরিক সবুজে।

তুমিও আসতে পারো। প্রতীক্ষিত। তোমার পায়ের শব্দে কান রেখে
শুয়ে ; স্মৃতি মুখরিত ভিজে মেঘ-জলে মুখ এঁকে।
আমি যেতে পারি কিন্তু, ভয় আর ফিরব না কখনো এ ঘরে ;
বাড়িও নিঃশঙ্ক হাত, আমরা মিলিত হব দুরন্ত সফরে।

অনেকটা বৃষ্টির মতো

১

বৃষ্টি থেমে গেলে নয়। বরং বৃষ্টিতে মুখ ডুবিয়ে আসবে,
ধুয়ে পরিচ্ছন্ন মুখে, হাতের চোখের কালি সব রঙ বৃষ্টির ধারায়
ধুয়ে যাবে। দুঃখিত হব না।
বরং স্বচ্ছন্দে আসবে, স্পষ্ট হব।
মনে রেখো, বৃষ্টির মতন স্পষ্ট হতে হবে।
মনে রেখো, আমরা বৃষ্টির মতো সহজ প্রবাহ।
এসো, বৃষ্টি থেমে গেলে নয়।

২

আমি কি বলবো চোখে-চোখ রেখে
বৃষ্টিতে শরীর রেখে, বৃষ্টিকে শপথ করে
বলতে পারবো আমি কখনো তোমাকে ?
'ত্যাখো সবুজের রঙ্ আবার সবুজ হলো গৈরিক প্রহরে,
সব ধুলো কাদা ধুয়ে ত্যাখো সবুজ শরীরে মাঠ ভাসছে কেমন'
বলতে পারবো আমি! 'আমরা সবুজ হবো'।
আমার অহংকারে দীপ্ত হবে গৈরিক আকাশ।
এসো, বৃষ্টি ভিজে চলে এসো ;
অপেক্ষায় ফুরিয়ো না,
অপেক্ষা কোরো না মিথ্যা বসন্তের রঙিন পাপড়িতে :
তীব্র রঙ চোখে বড় লাগে।

৩

বড় আলো। আলোর রঙিন ভীড়ে, তুমি তো জানো না,
দুঃখগুলি ওৎ পেতে থাকে।
তুমি তো জানো না, নানা রঙিন পাপড়ি ঝরে যাবে
শিশিরের ঘায়ে, ওরা বৃষ্টিও ছোঁবে না। ছুঁতে পাবে না কখনো।
তুমি তো গোধূলি সন্ধ্যা, প্রভাতে শিশিরকণা কখন উধাও,

তবুও আকাশ যদি নাচে
তবুও বাতাস যদি ডাকে
যদি রঙ ছড়ায় বাতাস চোখে মুখে
যদি রঙ জড়ায় হাওয়ার কালো চুলে—
ধুয়ে যাবে ভোরের বৃষ্টিতে ;
তুমি এসো বৃষ্টি নিয়ে, থেমে গেলে নয় ।

৪
বৃষ্টির পায়ের শব্দে তুমি । বৃষ্টির নরম শব্দ তুমি ।
আমি যে বৃষ্টির শব্দে মুখ রেখে, চোখ বুজে বৃষ্টির শরীর ।
আমিও বৃষ্টির শব্দ বাতাসে-বাতাসে,
আমিও বৃষ্টির স্পষ্ট নীরেট শরীরে ছাখো তোমার দুয়ারে ।
১৩৬৯

চি র কা লে র

স্বচ্ছ আমার জলের আয়না যেটাই সেখানে মনের বায়না ।
শ্রাবণে বৃষ্টি, হু-হু করা বুকে শীতল বাতাস ।
বিকালে নদীর হাওয়ায় বেড়ানো, ঢেউ ভাঙা দেখা, মেঘের আকাশ,
আকাশের মাঠে হাওয়া-রাখালের চোখে বিদ্যুত, বৃষ্টির ছড়ি,
শ্রাবণ ধারায় মাঠে ঢল ঢল যৌবন-হাসি
সবুজের ছড়াছড়ি ।
ঘুম নেই চোখে, ঘুম নেই শুধু
তারায় তারায় রাতের গানের ছন্দ শেখা,
চলতে চলতে আনমনা হয়ে থমকে দাঁড়ানো
ইচ্ছার শিশু অঞ্জলি তুলে দুহাত বাড়ানো
: সবি যদি যায়—এ গৃহ, শরীর,
থাক না হারিয়ে অহেতুক ভীড় ।

সব চলে গেলে পুরানো ফাইলে ধুলো ঝেড়ে ফের
নতুনের নামে পড়বো আবার পুরনো চিঠিই যা চিরকালের ।

এ ঝড় ফিরিয়ে নাও

ঝড় এলো। ঝড় ঠিকই এলো।
যা চেয়েছিলাম, তাই। চেয়েছিলাম আমরা, একটা ঝড় হোক।
তুফান আসুক ভেসে যাক্,…কিছুটা ভাসুক জলে,না হলে হয় না কিছু।
প্লাবন না হলে দেখো, কিছুই হবে না।

তুফান উঠলো ঠিকই, যা চেয়েছিলাম।
সমুদ্র এমন করে উথলে উঠবে জানতাম, বুঝতে পেরেছিলাম।
সেজন্য এমন ঝড় নয়, এমন ঝড় তো নয়,
ঝড় এলো কিন্তু না না, এমন কখনো নয়, এ ঝড় চাইনি।
এমন কলহ নয়, এমন তিক্ততা, দুঃখ নয়।

ঝড় এলো তুফান তুললো ওরা।
ভেঙে গেল, মুহূর্তে চৌচির হলো বন্ধুত্ব, সখ্যতা,
অনেক দেখানো প্রীতি ফুটে উঠলো কুটিল ঈর্ষায়।
এমন চাই নি, না না, এমন তো নয়।

এমন বিপন্ন হতে, এমন বিস্মিত হতে চায় নি বন্ধুরা,
এমন দুঃখিত হতে, এমন লাঞ্ছিত হতে নয়।
এ দুঃখ কেমন করে ঘুচবে, জানি না,
তোমরা যদি বলতে পারো কেহ,
যদি বলতে পারো আসল কথাটা কি যে।

এ ঝড় ফিরিয়ে নাও, এমন দুঃখ দিয়ে নয়।
নিজেকে জাহির করা এমন কলঙ্ক দিয়ে, নয়।
এমন দৈন্যতা দিয়ে, এমন ব্যথিত করে নয়,
এ ঝড় ফিরিয়ে নাও। এ ঝড় চাই না।

দাদুর মৃত্যুর আগে : বাঁচবার প্রার্থনা

(৫ই পৌষ ১৩৬৮ স্মরণে)

১

আমাকে একটা নষ্ট ফলের আসন দিও।
খুঁতে আপেল, আঙুর না দাও, পেয়ারা কিংবা শশার অন্তত,—
কারোর অনিষ্ট করব না।

আর যে কটা দিন আছি রে বাঁচতে,
যে কটা দিন আরো দুঃখ পেতে বেঁচে আছি,
পোড়া চোখে জল ফেলতে রয়েছি সংসারে,
একটু আসন দিও তোমাদের ঘরে অন্ধ কোনে ।

কারোর অনিষ্টে আমি নই,
বরং তোমাদের দুঃখ সুখের কথায় কিছু
স্মৃতি রোমন্থন করতে পারি, শৈশবের অনেক গল্প তো
এখনো স্পষ্টই মনে, অবিকল সহজ এখনো।
না, সে সব বলব না কিছু, তোমাদের সঙ্গে তার যথেষ্ট অমিল,
সংঘাত ঘটতে পারে স্থান-কাল-পাত্র ব্যবধানে ;
এ সমুদ্র নিস্তরঙ্গ থাকবে তোমাদের কলতানে,
নদীর উচ্ছ্বাসে স্থির থাকবেই,
ভোরের হাওয়ায় পাকা হাড়ের মেরুদণ্ডটা শিরশির করে উঠবে,
মন্দ কি

তাতে আমার দুঃখ কি ?
কারণ, আমি তো আর নিজস্ব কিছুই নই, কিছুই হব না।
কিছুই থাকবে না। আমার আর কিছুই থাকবে না।
তোমাদের সুখের সংসার, সপুত্র-কন্যার ঘরে দুঃখ হয়ে নয়,
বরং প্রীতি, ভালোবাসা। ভালোবাসা হয়ে থাকবো আর
যে কটা দিন···।

২

পঙ্গু অঙ্গ ঢেকে রাখবো। চোখের জল ফেলবো না;
না, দীর্ঘশ্বাস নয়। দীর্ঘশ্বাস ফেলবো না,
পাছে তোমার সংসারে ঝড় ওঠে;
দেয়ালগুলো ধ্বসে যাচ্ছে মনে করো;
পাথরগুলো কেঁপে উঠছে মনে করো;
পাছে তোমার মুখের গ্রাস গলায় আঁটকে আসে,
তোমার দম বন্ধ হবার উপক্রম হয়।
পাছে মনে করো
তোমার ভবিষ্যতের কচি হাড়ে আমার পঙ্গুতার যন্ত্রণা
ডুকড়ে উঠবে,
দুঃখের বীজ নাচবে তাজা স্রোতে।

৩

চোখে জল আনব না। বুকে দীর্ঘশ্বাসও নয়।
খুশী হব। শুধু সুখী হব তোমাদের হাসি দেখে, বুকে সাহস দেখলে
আমাকে একটা নষ্ট ফলের আসন দিও,

আর যে কটা দিন আছি রে বাঁচতে,
থাকতে দিও তোমাদের ওই সংসারের এক কোনে।

কোন প্রেমিকের উদ্দেশ্যে

তিলে তিলে কঠিন আঘাতে
তুমি পঞ্চশর জয়ী। এক অহল্যার হাতে
এ বিশ্বের বিশাল সংসার
যাচাই কোরোনা তুমি, সংসার বিচিত্র বড়, তার

রন্ধ্রে রন্ধ্রে নানা রঙ। তুমি এক রঙের নিবিড়
সন্ধান পেয়েছ, এক ফুলে পরিপূর্ণ সংসারের ভীড়
নয়। বৈরাগ এনো না ডেকে সংসার সন্ধানে ;

অহল্যা নির্জনে নয়, অহল্যার টানে
সংসার আনন্দময়, ছাখো সবখানে।
বসন্ত মূর্ছিত হয় আরেক বসন্ত আকাঙ্ক্ষায়,
দস্যু শীত শান্ত হয় আনন্দিত রজনীগন্ধায়।
তুমি মিথ্যে অহল্যা-সন্তাপে
নিজেকে বৈরাগী করো। এ সূর্য্যের তাপে
বসুধার অনন্ত সন্তান
দীপ্র হয়। খুঁজে পায় আপন সন্ধান।

তোমার পূর্ণতা সাজ নয়,
আনত নয়ন তোলো, ছাখো আজো ফোটে ফুল ;
চরাচরে নিবিড় অন্বয়।

গোলাপ, মৃত্যুর আগে

১

লজ্জায় গোলাপ হয়ে আর,
অমন গোলাপ হয়ে ফুটোনা প্রাঙ্গণে ;
বড় লোভী। বড় লোভী হয়ে উঠি গোলাপের আকণ্ঠ লজ্জায়,
তুমি তো জানো না এই সন্ন্যাসীরা কি ভীষণ লোভী।
এই যে আঙুলগুলি ছাখো শান্ত নির্লিপ্ত বালক উড়ু উড়ু,
এই যে অলস ছাখো, অনিচ্ছুক নিতান্ত বৈষ্ণব.
এদের বিশ্বাস করো ?

কখনো কোরো না ;
গোলাপের জন্য এই সন্ন্যাসীরা কি ভীষণ কাপালিক, জানি।
প্রেতের মতন হিংস্র হয়ে ওঠে ;
কবরে প্রেতের মত সারারাত জ্বালিয়ে আগুন
শ্মশান রচনা করে গোলাপের।

২

অমন গোলাপ হয়ে আর
ফুটোনা কখনো,
অরণ্যে দারুণ দস্যু, রিপুভয়,
দস্যু কি ভীষণ তুমি জানো না এখনো ;
বড় ভয় কাপালিক সন্ন্যাসীকে, বড় ভয়,
অমন গোলাপ হয়ে আর ফুটোনা প্রাঙ্গণে
তাহলে যে কোনোদিন ফুটবে না আর ;
তাহলে যে কোনদিন অমন উজ্জ্বল আলো
হাজার দুঃখেও আর ফুটবে না একটি গোলাপে।

স বি অ ভ্যা সে র ব শে

শুধু অভ্যাসের বশে বেঁচে আছি ;
না হলে কিছুই নেই।
অভ্যাসী আঙুলে নাড়াচাড়া ক'রে
দিনগুলি রাত হয়, রাতগুলি পরিণত দিনে।

খুঁজিনি কখনো এর মানে,
অমর্ত্য পাই নি কোনদিন
নিতান্ত এ প্রাত্যহিকতায়।
শুধু অভ্যাসের বশে আকর্ণ জটিল হাসি ;
এই বেঁচে থাকা,
না হলে কিছুই না, কিছু নেই।

কোনমতে দিন এলো রাত্রির বসন ছেড়ে রেখে,
কপালে সিঁদুর মাখামাখি,
চোখে মুখে ঘুম, লজ্জা, ক্লান্তি, অবসাদ
ওসব জলের ঝাপ্টা তুলে নিল,
কলসীতে জল ভরতে ঝাপসা হয়ে যায় সব ছবি—

আড়ালের কাপড়টা ফের খুঁজতে হয় ;
সারারাত ঘুম নেই দুচোখে, শরীরে,
তবু অভ্যাসের বশে শুয়ে থাকা,

দুহাতে কঠিন খিলে বুক বেঁধে পড়ে আছি
অভ্যাসের বশে সব নিয়ে ঘিরে আছি :
ছিন্ন বস্ত্র, জীর্ণ গৃহ, কিছু কবিতাব খাতা,
অভ্যাসী আঙুলগুলি ইহাদের অহেতুক চতুর প্রহর্তা

অমর অধিকার

একা কোথায় ঘুরছো অন্ধকারে
তুমি আমার অমর অধিকার ;
আমি তোমার ছায়া-শরীর, ললাটে কুমকুম,
তোমায় খুঁজে অন্ধ হলো পাখি ।

এ ঘরে তুমি এসো না, ঘরে নিরেট অন্ধকার,
ইটের ঘরে মানুষগুলি পাথর হয়ে আছে,
পাথরে মাথা ছুঁইয়ে শুধু প্রতিধ্বনি ফেরে—
এ ঘরে নয়, এ ঘরে তুমি এসো না অন্ধকারে ।

আমি যাব ।

থেকো অনালস্য দরজা খুলে ;
অনেক দুঃখ জমানো নীল হ্রদে,
ব্যথার নীল ফুলটি তুমি ফুটিয়ে রেখো।
ভালোবাসা, ভালোবাসা, ভালোবাসা
আবহমান বন্ধু আমার, স্বর্গ আমার।

নদীর কথা

তার চেয়ে এই ভালো, বসে থাক্ খেলা কর মাঠের বাতাসে
এখানে নদীরা আছে, ভ্রমর গুঞ্জন, ফুল হাসে।
এখানে হৃদয় আছে, নদীরা কখনো তোর কাছে
কাল্পনিক গল্পকথা বলবে না কিছু, তুই পাছে
মোহের প্রলাপে তাকে ভালোবেসে কাটাস প্রহর ;
সে তোকে বলবে জানি : আমাতে করিস্ নারে কখনো নির্ভর-
আমি মুঠো মুঠো হাসি, ভোরের বাতাসে খেলা করি,
আমি আলো দিনভর, সায়াহ্নে গৈরিক আর রাতে শর্বরী।
হাসিতে ফোটাই ফুল, রেণু মাখি আপন শরীরে,
যে আমাকে ভুলে যায়, আমি তাকে ডাকি ফিরে ফিরে,
দশ আঙুলে ভাঙি কূল, জড়াই দুচোখে শাদা ঘুম
আবার ভোরের ঠোঁটে লিপে দিই রঙিন কুমকুম।

বলবে আবার ডেকে : ওদিকে যাস্ নে মিছে পথের বিভ্রমে
হারাবি, হারাবি তুই জটিল সংসারে ক্রমে ক্রমে।
তার চেয়ে বসে থাক্, খেলা কর মাঠের বাতাসে
এখানে অনেক মাঠ ঘাস নদী কথা কয় আকাশে আকাশে।

চিলেঘর

শ্রীযুক্ত সঞ্জয় ভট্টাচার্য শ্রদ্ধাস্পদেষু

সব ব্যর্থ শূণ্য ম্লান একাকীত্ব হারাই এখানে
শুধু এই ঘরে বসে একটু নিশ্বাস পাই প্রাণে ;
যদি পাই, ছোট এই চিলেঘর সঙ্গীত-মুখর,
মধুময় কয়টি প্রহর।
যখন পৌঁছেছি এই ঘরে
উদার সোহাগ পাব বলে, উত্তীর্ণ ধূপের ছায়া
হাওয়ার আঁচলে থরে থরে,
নক্ষত্রের মমতায় প্রদীপের আলো থরথর,
চিলেঘরে নির্জনতা ; ভালোবাসা নির্জন মুখর।

নিত্য দুই বেলা
ঘর ভাঙা, ভাঙাগড়া খেলা
সে আমার নয়, কিংবা আরেক ঋতুতে
পাখির নিষ্ঠায় নীড়ে-নীড়ে মন থুতে
চাইনি কখনো আমি, সে আমার নয়।
আমার মৌমাছি স্বাধ গুঞ্জনমুখর প্রাণময়।

এখন হঠাৎ দেখি ঘুম থেকে উঠে
কখন দস্যুর হাত উপড়ে সব নিয়ে গেল লুটে ;
স্মৃতির কাঁটায় বিঁধে রয়েছে কয়টি ভাঙা কাঠি।

তাহলে কোথায় পাব, এখন কোথায় তার সন্ধানে যে হাটি !

দো কা নে র ঝু ল ন্ত মা ং স টা কে দে খে দে খে

প্রতিদিন দোকানের ঝুলন্ত মাংসটাকে দেখে দেখে
দুটো ঘোলাটে মৃত চোখ ছুঁয়ে হাটুতে হাটুতে
মনে হলো : আমিও কখন ঝুলে পড়েছি ওখানে—
দোকানের শিয়রে মালিকের অদৃষ্ট হয়ে উলংগ শরীরে
বিংশ শতাব্দীর সভ্যতা নিয়ে ঝুলে আছি— ;
আমার পাংশুটে শরীরের রক্তহীন দড়ি পাকানো শুকনো হাড়গুলিকে
কেটে কেটে নিয়ে যাচ্ছে ওরা—
ওদের দারুণ ক্ষুধা ;
ঘরে গিয়ে ওরা নিশ্চয়ই কুকুরের মতো সেই হাড়গুলি চিবুচ্ছে
গালের কস্ বেয়ে হয়তো তখনো রক্ত গড়াচ্ছে— ;

মনে পড়ে,
দুআঙুলে আমার কোমর ধরে তুলে ওজন দেখছিল ঝোলাবার আগে,
চীৎকারের সাধ্য ছিল না আমার, ভেবেছিলাম,
মরা ভেবে ওরা আর মারবে না,
কিন্তু সে সব কিছুই সম্ভব হলো না, বরং,
ঝোলাবার আগে গলায় একটা পা দিয়ে জিবটা ছিঁড়ে নিল,
শাদা চোখ দুটো আঙুল দিয়ে খুবলে উপড়ে ফেললো,—
খদ্দেরদের চোখে ধুলো দিয়ে রাখলো ;
আর কিছুই দেখতে পেলাম না। বুঝলাম, বুকের মধ্যের
কোনো একটা নরম অংশ কারো থলিতে উঠে যাচ্ছে।

প্রতিদিন দোকানের ওই ঝুলন্ত মাংসটাকে দেখে দেখে
নিহত হচ্ছি। এ দুঃস্বপ্নের চাবুক আমার পিঠের চামড়া খসিয়ে নিল—
সারারাত দুঃস্বপ্নটা আমার শরীরে গিঁথে থাকে,
কিছুতেই ভুলতে পারি না ভুলতে পারি না ওকে।

এখনো কিছু

এখনো কিছু ভুলতে শেখো। শিশুর কচি দু হাতে সব জড়ো
করো না আর। ছেঁড়া কাগজ কুটোয় ঘর ভরো!
একটি দরজা খুলেই রেখো খোলা মাঠের দিকে—
নইলে দেওয়াল ফাটবে যে চৌদিকে!

যারা তোমায় ভালোবাসে তাদের জন্ম দরজাটি উন্মুখ
থাক্ চিরকাল। আজন্ম এই সুখ।
তোমার সুখে দুঃখে তারাই, চিরকালের আনন্দ সংসারে
হাত মিলিয়ে থাকতে যেন পারে।
তাদের তুমি বেঁধো না চার দেয়াল তোলা ঘরে
মনের কোণে স্বল্প পরিসরে।

এখনো কিছু ভুলতে শেখো, চিরকাল এই মনে রাখার জ্বালায়
হৃদয় শুধু দগ্ধ হবে, স্মৃতি-সর্বনাশায়।
মুগ্ধ হওয়ার দারুণ ভয় নিবিড় কোনো সুখে,—
দিও না হাত। কে ভুগতে চায় সারাজীবন কুটিল এক অসুখে
দেওয়াল তুমি তুলো না ঘরে, কিংবা এই নিজের চারিদিকে,
নদীর দিকে দরজা রেখো, নইলে মন ফাটবে যে চৌদিকে।

সঙ্গোপনে থাক্

সঙ্গোপনে থাক্ আমার বুকের মধ্যে—।
পাপড়ি ঢাকা একলা কুসুমিত
নীরব চয়নে থাক, তেশরা মাঘের গন্ধ
প্রথম সূর্যের রক্তে গভীর বিশ্বাসে।
একটি বিশ্বাস যদি সঙ্গে ফেরে চিরকাল
নিশ্বাসের অপাপ শুদ্ধতা;

বিশ্বাসী মেঘের মত
বৃষ্টি নিয়ে আকাশে-আকাশে পায়চারী করে আমরণ—
নিঃশব্দ ধ্বনিত হয় তাহলে হয়তো কোনোমতে
বেঁচে যাব এই সব যন্ত্রণার ভীড়ে।
দীর্ঘশ্বাসে অপ্রলুব্ধ। না, অন্ধকার নয়, মৃত দীর্ঘশ্বাস
আমাকে পাবে না ছুঁতে
কোনোদিন,—যদি তুমি সমস্ত আকাশ ভরে
মেঘের স্পর্দ্ধায় বুকে হাত রেখে দাঁড়াও সম্মুখে।

ট্রে নে উ ঠ লে

ট্রেনে উঠলে মনে থাকে না কিছু।
পিছনে কোন ষ্টেশন রইল,
তাদের নাম; তাদের মুখ, তাদের সব স্মৃতি
রইল বাসি ফুলের সিংহাসনে;
সামনে কখন ষ্টেশন এলো
হারিয়ে গেল কখন আবার
ঝোড়ো হাওয়ায় এলো চুলের মত,
মনে থাকে না, মনে থাকে না
ট্রেনে উঠলে মনে থাকে না,
থাকে না কোন স্পষ্ট ছবি চোখে।
মনে পড়ে, মনের আশেপাশের ধূসর বেলা মনে পড়ে,
শুধু একটি নদী
মনে থাকে,—নদীর ভালোবাসা;

আকাশ ভরা নদীর নীল গভীর ভালোবাসা;
ট্রেনে উঠলে শুধু একটি সন্ধ্যা বেলার নদী

মুখর হয়ে হাওয়ায়
মিলিয়ে যায়, মিলিয়ে যায় ক্রমে।
ট্রেনে উঠলে মনে থাকে না কিছু।

বাইরে কেবল ঝড়ো হাওয়া
আকুল করে তোলে মাঠের গান
বাইরে কেবল বৃষ্টি অবিরাম
কিসের ব্যথা টনটনিয়ে ওঠে ঝড়ের বুকে ;
বুকের মধ্যে কারা এমন মুখর হয়
কারা এমন দুরন্ত হয় ট্রেনে উঠলে ;

ছোট বেলার কাচের টুকরো, পাখির পালকগুলি,
উথলে ওঠে ধানের শিষে নদীর হাওয়ার মত,
পিছনে সব ষ্টেশনগুলির মত যাদের
বুকের মধ্যে মূর্ছিত সংলাপ।

ট্রেনে উঠলে মনে থাকে না, মনে থাকে না কিছু।

মা ণি ক ব ন্দ্যো পা ধ্যা য়

হঠাৎ আলো দপ করে নয় ;
আত্মকথায় ধিক ;
বাংলা দেশের কাদা জলে মাণিক।

হঠাৎ আলো জ্বলে নি দপ করে, কখনো না,
ধিকি ধিকি আগুন সয়ে বুকে,
পুড়ে পুড়ে ঝলসে দেহ কালো,
বিষিয়ে ওঠে সমস্ত নীল শিরা,
আগুন থেকে আমরা পেলাম একটি খাঁটি হীরা।

ছায়া

(শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্র শ্রদ্ধাভাজনেষু)

আমায় ছেড়ে কোথায় যাবে,
আমি তোমার রক্তে প্রবাহিত,
আমি তোমার প্রসন্ন কৌতুক
বৃষ্টি ধারায় প্রত্যহ বর্ষিত।
আমি তোমার যৌবনে গর্বিত,
আমি তোমার আনন্দে নন্দিত।

আলোয় একা চলেছিলাম দুরন্ত কৌতুকে,
তোমার পাশে ছিলাম বড় সুখে।
আলো কোথায় হারিয়ে গেল, একা চলতে ভীত
কোথায় যাব, ঘরে চলো, আমরা চিরকালের পরাশ্রিত।
আমি তোমার হলাম অনুসঙ্গ।
চতুর্দিকে অন্ধকারে বিলীন আমি। সাঙ্গ হল সারাদিনের রঙ্গ।

ঈপ্সা

আমাকে তোমার ছায়াটুকু দেবে ?
নির্জন রাতের পায়চারী, জ্যোৎস্নায় ভেসে বেড়ানো মুহূর্তগুলি,
আকাশে বাড়ানো দুহাতের উজ্জ্বল আকাঙ্ক্ষা ;
শৈশবের চীৎকার—অকারণে নেচে ওঠা,—
আমাকে আবার দেবে ?

তোমার জন্যে প্রতিটি মুহূর্ত ব্যাকুল হয়ে থাকার দিনগুলি
আবার ফিরিয়ে দেবে ? সারারাত না ঘুমিয়ে থাকা,
নদীর ধারে ধারে বালিতে ছুটোছুটির দিনগুলি,

সারাদিন লুকিয়ে বেড়ানোর খেলাগুলি আমায় আরেকবার
দেখতে দেবে ?
আমাকে আরেকবার ভালোবাসতে দেবে ?

প্রখর রৌদ্রের আলো

প্রখর রৌদ্রের আলো বাগানে পুকুরে মাঠে
এসো স্নান করি, এসো,
বাগানে ফুলের গন্ধে স্নান করি,
এসো রৌদ্রে ডুব দিই
গভীর আলোয় ;

তোমার কুটির এই কটা দিন রৌদ্রময় রেখো ।
রৌদ্রময় হয়ো তুমি রৌদ্রের শরীরে পিঠ দিয়ে

চূর্ণ পদাবলী

১. বেশ তো ছিলি একা ;
আবার কেন ঘাটতে গেলি
নোংরা গলি । কী ছাই পেলি ?
আকাশ ভরে কেবল চিত্রলেখা ।

২. ভুলতেও দুঃখ তোর
মনে রাখা,—সেও এক জ্বালা,
তাহলে দুঃখেই পূর্ণ হয়ে থাক বুকের পেয়ালা ।

৩. দুর্লভ সুখের জালে
বন্দী হয়ে প্রত্যহ সকালে
সায়াহ্নে আবার ভেঙে যায় গড়াগড়ি,
ছিন্ন মালা গাঁথে বসে একাকী শর্বরী ।

কোনদিন জানবো না কোথায় কেমন করে আছি,
প্রত্যহের ছলনায় তবুও কেমন করে বাঁচি।

৪. ও সব শুধু শৈশবখেলা, বালিকা-প্রতিশ্রুতি,
আর কিছু নয়? আর কিছু নয়, অরুন্ধতী?

৫. এতো সুখ রাখবো কোথায়
বলে দে;
দুঃখ যদি সুখের চেয়ে অধিক,
আমায় দুঃখ দিস কেন রে!

৬. তুমি অন্ধকারের শুভ্র ফেণা,
অন্ধকারের মতই একাকার,
তুমি জ্যোৎস্না রাতের নির্জনতা
তুমি একলা বুকের হাহাকার।

৭. তোমাকে চেয়েছি বলে সমস্ত আকাশ মুখরিত।

দুয়ারে দাঁড়িয়ে নয়, ঘরে এসো

দুয়ারে দাঁড়িয়ে নয়; ঘরে এসো;
বিচার কোরো না জানালা দিয়ে আগন্তুক!
তাহলে এসো না তুমি, আমি একা
দিগন্ত গম্বুজে চোখ রেখে ডুবে থাকি,
ঘরে না আসবে যদি জানালা চিরতরে অপসৃত হোক তোমার জন্যে;
নির্জন প্রহরগুলি বিলম্বিত হোক কোটি নক্ষত্রে ভিজিয়ে।
হয়তো আমাকে সহ্য না করতেও পারো এ সময়ে,
যেহেতু এখন আমি বড় ক্লান্ত; তীক্ষ্ম অভিজ্ঞতাগুলি নিয়ে ভারবাহী,
বেঁচে আছি অজস্র যন্ত্রণা নিয়ে, বুকে তীব্র ব্যথা।

সাংবাদিক কখনো ছিলাম কিনা মনেও পড়ে না,
কবিতা লিখি না আমি, উপন্যাস কখনো লিখিনি,

সঙ্গীতজ্ঞ কোনকালে ছিলেন কি আমাদের পৈত্রিক ভিটেয়
মনেও পড়ে না, মনে কিছুই আসে না এই বিপন্ন যৌবনে ;
এখন বড়ই ক্লান্ত ; মুখের অজস্র দাগে
শিরাগুলি পাকিয়ে উঠেছে,
তীব্র ঘৃণা চোখের কোটরে ।
আঙুলে অনেক স্মৃতি উৎসবের, অনেক মৃত্যুর, ঘুম,—
কতদিন ঘুমোই নি রাতে ।

তুমি তো কখনো ঘরে প্রবেশ করো নি ;
হয়তো কখনো মাঠে দাঁড়াও নি আকাশের নীচে,
আকাশ দেখোনি কোনদিন। আকাশ কোথায় ডানা ছড়িয়েছে
সূর্যকে ছাড়িয়ে, সে-আকাশ দেখোনি কখনো ।
চিরকাল জানালা দিয়ে
সমুদ্রের অরণ্যের আকাশের স্বপ্ন বিরচিত ।
প্রতিবেশীদের মত জানালা দিয়ে দেখতে এসো না,
জানালা দিয়ে কিংবা ওই দুয়ারে দাঁড়িয়ে নয়, ঘরে এসো,
নতুবা অপেক্ষা কর, জামতলায়
নিয়ে যাব, সবুজ সমুদ্রে ওই আকাশের নীচে ।

ঈশ্বরের আলোয়

মানুষেরা চিরকাল এই সব সবুজ নদীতে
স্নান করে, জলকেলি মাছেদের মত, নীরব নিভৃতে
মাছের ডানার মত, অবিকল্প ইচ্ছা মনে নিয়ে
লেজ ঝাপটায় জল ছিটিয়ে ছিটিয়ে ।
মানুষেরা চিরকাল পাখিদের মত
আকাশকে ভালোবাসে, আকাশ বিহারী অবিরত ।

মেঘে পাকা ফল নেই, শুধু আছে ফোঁটা কয় জল,
তা হোক, তবুও ও-ই পাখিদের আকাশ সম্বল।
মানুষেরা চিরকাল এই সব সবুজ নদীতে
জাল নিয়ে ঘুরছে নিভৃতে,
একটু সবুজ যদি ফিরে পায়, এ প্রৌঢ়ে আবার
সুখ হবে। চোখে সবুজের নেশা। বুকে তৃষ্ণা, ঘরে হাহাকার ;
ঈশ্বর-মমতা-আলো খেলা করে মাছের ডানায়,
আনন্দিত সরোবর কানায় কানায়
ভরপুর। ঘরে নীল পর্দায় হাওয়ার শব্দ। দরজার খিলে
ক্লান্ত হয়। মুক্তি খোঁজে। আলোকিত মায়াবি টেবিলে
ঈশ্বর, তোমার উপস্থিতি
মানুষেরা চিরকাল খুঁজে ফেরে একটু সবুজ স্নেহ প্রীতি।

এই সব সবুজ নদীতে স্নান, জলকেলি।

—যদি পায় এ প্রৌঢ়ে আবার

হৃদয় সবুজ হবে। সুখ হবে। ঘুচবে বুকের তৃষ্ণা, ঘরে হাহাকার

আবহমান দারিদ্র

ভেবেছিলাম তুমি আমার ভাঙা দেয়ালে
বাঁশের কঞ্চিতে
পাথরের ইমারত গড়ে দেবে।
তোমার লাল চোখ
কালো আঙুলগুলি
তোমার শক্ত বুকখানা আমায় ভয় দেখায় নি।
বরং তোমার স্পষ্টতায় গভীর ঈর্ষা ছিল।
মুগ্ধ হয়েছি,
আমি তোমায় নিবিড় ভাবে প্রার্থনা করেছি।

ভেবেছি তাহলে বুঝি গভীর অন্ধকারেও
ভাঙা কড়ির দেয়ালে
কোনো উজ্জ্বল দিনের শুভ্রতায়
পাথরের ইমারত নিয়ে আসবে কঠিন দুঃসাহসে!
কিন্তু এ কি করলে,—
কর্পূরের মত কোথায় হারিয়ে দিচ্ছ সব ?
কোথায় ফুরিয়ে দিচ্ছ অন্ধকারে!
তোমার মধ্যে উজ্জ্বল শুভ্রতা দেখবো, ভেবেছিলাম।
আমি অপেক্ষা করবো,
এই অন্ধকারে
পাঁকের মধ্যেই একদিন পাবো বলে,
অপেক্ষা করবো ভাঙা দেয়ালে বুক রেখে।

প্র তি বা দ

১

অথচ ছেলেটির কি দুরন্ত সাহস
ভর-দুপুরে তেঁতুল তলায় কাঁচা তেঁতুল খোঁজে।
খাঁ খাঁ রদ্দুর। বাতাসের চীৎকার। ভয় করতে শেখেনি জুজুকে।
ভয় করে না সমুদ্র কি পাহাড়। ভয় করে না দুরন্ত দুপুর;
ভয় করে না অন্ধকারের শরীর।

২

অথচ শূণ্য বৃক্ষ; নিঃসন্তান স্তব্ধ প্রহর। এতক্ষণে সওদাগর পাল
তুলে দিয়েছে নদীতে।
নদীতে প্রচণ্ড ঢেউ, বাতাসের প্রচুর উৎসাহ ওই পালে;
বালক বৃক্ষের নীচে শূণ্য হাতে দুরন্ত সাহসে নির্ভর।
বাতাস, তোমার একি দুর্লভ কৌতুক প্রতি মুহূর্তে-মুহূর্তে।
নিস্পন্দ বৃক্ষের প্রহর।

অকালে কোলের ছেলে কেড়ে নেওয়া জননীর বুক,
বাতাস কেবল হু হু করছে শরীরে।
বৃক্ষের শরীরে এত মায়া ছিল কে জানতো আগে।

৩

অথচ ছেলেটির কি দুরন্ত সাহস।
দমকা বাতাসের মত গভীর প্রতিবাদের স্পর্দ্ধা ভর করে ওই কচি
মুঠোর মধ্যে।
কারা যেন অন্ধকার জুজুর মত ঠোঁট উল্টায়ে হাসে;
তবুও হাজার হাজার কচি মুঠোর প্রতিবাদে তেঁতুলতলা
ছেয়ে গেছে।

সহবাস ও অন্যান্য

১

অহংকারের সঙ্গে সহবাস; ছিঃ ছিঃ লজ্জায় মরি
তোমার বাগানে গোপন দরজা রেখো না মুক্ত;
ওপথে অবাধ অন্ধকারের সুযোগ রুদ্ধ রেখো,
আর যাই হোক, ছিঃ ছিঃ শেষে কিনা অন্ধকারের সঙ্গে!

২

যদি পুড়তেই হবে স্থিরীকৃত;
আগুনে নয়, আগুনে দগ্ধ হয় না
বুক। রৌদ্রে পুড়ুক অবিকৃত
কৃষ্ণচূড়ায়, ভালোবাসায় আকাশ সুবিস্তৃত।

৩

অবিশ্বাস বড় তীব্র, তীব্র বিষ শিরায় শিরায় সংক্রামিত
হয়। অবিশ্বাসী কখনো হয়ো না তুমি বাতাসের
পাখিদের বৃক্ষদের কাছে।
তুমি জানো, অবিশ্বাস বড় তীব্র। শিরায় শিরায় সংক্রামিত

বরং মাতাল হও বিশ্বাসী হাওয়ায় ;
আকাশের মত বুক চিতিয়ে দাঁড়াও
বিশ্বাসের মুক্ত প্রাঙ্গণে,
তারপর বাতাসের পাখিদের বৃক্ষদের মত ভালোবাসো।

অসুখে-লোকটা

লোকটার কি কঠিন অসুখ, অনাহারের চেয়েও কঠিন,
অথচ সামান্য চেষ্টাতেই সেরে যেতে পারত, ভাল হতে পারত অনায়াসে।
অথচ ওই ভাল হওয়ার পথটা চিনলো না।

সামান্য একটু উল্টেপাল্টে বলা, খানিক মেনে নিয়ে
চোখ বুজে সব সহ্য করা—ভিজে বেড়াল যেমন,
কি আর এমন কঠিন হত তার ?
যা এককোঁটা জলের মত সহজ ; অথচ তার হলো না, কিছুই হলো না।
কিছুতেই ভাল হতে পারল না লোকটা।

অনাহারের চেয়েও কি কঠিন অসুখে-লোকটা, অথচ বাঁচতে পারত,
পেতে পারত কয়েক বিঘের দালান রাজধানীতে,
প্রচুর খ্যাতি, প্রতিপত্তি, খাতির,
পেতে পারত পেতে পারত পেতে পারত
অথচ সেই পথটাকে সে আছড়ে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিল পথে।

নৈঃশব্দের দিকে

তোমরা আমাকে কিছুক্ষণের জন্যে ছেড়ে দেবে ?
ওই ফাঁকা মাঠটায় একবার ছুটে আসতে দেবে ?
কতদিন ওই গাছটার গুঁড়িতে একবার বসিনি নির্জনে,
কতদিন ওই পুকুরের জলে ডুব দিইনি !

আমাকে একবার ছেড়ে দেবে কিছুক্ষণের জন্যে ?
যেতে দেবে একা ওই পুকুরের পাড়ে তালগাছটার সঙ্গে
একটু আলাপ করতে।
কতদিন ওর সঙ্গে আমার আলাপ হয় না!
কতদিন হয়ে গেল আমি একবার চীৎকার করে উঠতে পারিনি ;
প্রত্যেকের একবার করে চীৎকার করা উচিত,
অন্তত একবার হাসা উচিত, বাতাস কাঁপিয়ে হেসে ওঠা ;
আমি কতদিন হাসি না। কতদিন হাসি দেখি না রৌদ্রের,
ওই সবুজ মাঠটার, বৃক্ষের, পুকুরের, মানুষের ;—
মানুষ কতদিন হাসে না।
আমাকে তোমরা কিছুক্ষণের জন্যে ছেড়ে দেবে,
তোমাদের সংসারের থেকে ?
কতদিন ওই পুকুরের মাছ ধরে নদীর জলে ছেড়ে দিইনি,
কতদিন ওই ফাঁকা সবুজ মাঠটায় যাইনি।
আমাকে একবার ছুটতে দেবে ওখানে ?
ওই ফাঁকা সবুজ মাঠটার গন্ধ,
সবুজ হাওয়ার শব্দ শুনিনি কতদিন,
আজ একবার শুনতে দেবে ?

কিছুই বোঝা যায় না

কিছুই বোঝা যায় না চোখমুখ দেখে,
বৃষ্টি হবে কি না
কিছুই জানা যায় না আকাশ দেখে,
ঝড় উঠবে কি না, বাতাসে হাত রেখে।
শিউলি কেন ঝরে গেল হঠাৎ নিঃশব্দে ;
আর কখনো ফিরে আসার চিহ্ন রেখে যায়নি কেন,
কেন এমন অমরতার নেশা, কিছুই দেখা যায় না চোখেমুখে।
সকালে বোঝা যায় না দিনটা কেমন যাবে,
কিছুই বোঝা যায় না বৃষ্টি হবে কি না।

অন্ধ তামস

(শ্রীশোভন সোম, বন্ধুবরেষু)

চেয়ো না, চেয়ো না মন তাকে
যে ফেরাবে প্রত্যহ তোমাকে
শুধু ব্যর্থতার ঘরে।
দীপ জ্বালা কিসের আশায়
যদি না অন্ধকার অপসৃত উজ্জ্বল শিখায়।
যে বীণার তার গেছে ছিঁড়ে
তাকে ঘিরে
কেন আর সময় ফুরানো।

তার চেয়ে মৌন-মন একমুঠো নির্জনতা আনো
গভীর চেতনা থেকে ; তারপর ইথারে ছড়াও,
যদি সেই বীত-স্বর ফের খুঁজে পাও।
ছিঁড়ে ছিঁড়ে আসে হাতে
তবু যেন সব সুতো পারো না গোছাতে।

এলোমেলো ছেঁড়া তারে ভাঙা ভাঙা স্বরে
(যদিও কখনো আসে আমার এঘরে
ভীরু প্রজাপতি, তাকে, পারি না পারি না হাতে নিতে
শৈশবের ইচ্ছাগুলি রঙিন ডানায় এঁকে দিতে।)

ডেকো না, ডেকো না মন তাকে
ক্লান্ত সায়ন্তন সুরে শুধু বিষ বিষণ্ণতা হাঁকে
ফেরি করে অন্ধকার রাত্রির ডানায়।
কী লাভ প্রচিত-চেষ্টা—পুনরায় যদি নিভে যায়!

তুমি বুঝতে পারছো না?

ওদের মুখের হাসি কবে উপড়ে নিয়েছ দুহাতে
এখন চোখের সামনে ঢালা অন্ধকার ;
সে কথা এখনো তুমি বুঝতে পারছো না ?

ওদের বুকের মধ্যে মৌসুমী বাতাস
সারারাত শুধু চীৎকার যায় শোনা,
হাহাকার আহা, কী ভীষণ হাহাকার ;
তুমি এখনো কিছু শুনতে পাচ্ছো না ?

তোমার সব রহস্য ওরা জেনে ফেলেছে,
তোমার হাতের নাচানো পুতুলগুলি কাল রাতে
মুখ ভেংচিয়ে ভয়ানক হাসছিল ;
দেয়াল থেকেই লাফিয়ে পড়ল, ভেঙে গেল ক'টা,
তবুও এবার লাফিয়ে পড়বে সব এক সাথে—
আর কোনদিন না ভাঙার স্পর্দ্ধায় ;
তুমি এখনো কিছু দেখতে পাচ্ছো না ?

চৌরঙ্গীতে সন্ধ্যাবেলায়

চৌরঙ্গীতে এখন আমি সন্ধ্যাবেলায়
লাইনবন্দী, বাড়ী ফেরার ইচ্ছা নিয়ে ;
চতুর্দিকে বিন্দু বিন্দু হাজার আলো
ঝিকমিকিয়ে জ্বলছে রাতের স্বপ্ন হয়ে ;
ঘাসগুলি সব থেতলে গেছে পায়ের নীচে ;
স্বপ্ন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি সবার পিছে।
কলেজ ষ্ট্রীটে যাব না আজ ; বইয়ের পাড়ায়
হাজার হাজার লেখক নাকি তৈরী করে ;

ওরা নাকি রবীন্দ্রনাথ বাঁচিয়ে রাখেন,
ওরা নাকি অনেক কিছু ক'রে থাকেন।
ওরা নাকি ঈশ্বরের চেয়েও ভীষণ
শক্তিমান। ওরা অনেক কিছুই করেন।

সন্ধ্যাবেলা এখন তো মা প্রদীপ জ্বেলে
মগ্ন হলেন লক্ষ্মীদেবীর পাঁচালীতে ;
বুকের মধ্যে মায়ের কাছে যাবার ইচ্ছে
নিয়ে এখন টুবি-র লাইনে দাঁড়িয়ে আছি।
বুকের মধ্যে মায়ের জন্য আকুল করা
স্বর্গ আমার, অমর হয়ে থাক চিরকাল।

একা-একা

একা একা রাত্রির মত মৌন নিঃসঙ্গ হৃদয়।
কি দিয়েছি, কি চেয়েছি, কবে কার কাছে
আজ তার কিছু আছে, কোন দাম আছে ?
অতীতের মৌন গুহা খোঁড়া বৃথা। নিছক সময়
ক্ষয়িয়ে দেওয়াই হবে সার।
তার চেয়ে এই ভালো, বেশ আছি। নির্জন দুরন্ত নদী।
রাত্রি। অন্ধকার।

বরং সব কিছু মিলিয়ে

(শ্রীপবিত্র মুখোপাধ্যায়, প্রিয়বরেষু)

বরং সব কিছু মিলিয়ে একটা মানুষ দাও,
একটা মানুষের ক্ষুধা দাও।
একটা পরিপূর্ণ মানুষের যন্ত্রণা।
পরিপূর্ণ মানুষের রক্ত দাও আমার শিরায়-শিরায়।

আমার মস্তিষ্কে, আমার বাহুতে, আমার ধমনীতে
একটা পরিপূর্ণ অস্তিত্ব দাও, হে ঈশ্বর!

বাইরে কার দীর্ঘশ্বাস

দেখ তো বাইরে কারা।
বৃষ্টিরা নেমেছে, চুপ। দরজা খুলে দেখ, অন্ধকার কার হাহাকার।
দরজা খোলো। দেখ তারা এলো কিনা। ঘরে
ডেকে আনো। বাইরে-বাইরে কেন ঘুরছে, ঘরে ডাকো।

বেশ তো, আলোয় কষ্ট হ'লে আলো থাক। তারা
বুকের আলোয় দীপ্ত করে দিক ঘরের প্রশস্ত চৌদিক
অন্ধকারেই আসুক বুকে উদ্ভাসিত প্রসন্নতা জ্বালিয়ে নির্ভীক।
তাদের পায়ের শব্দ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে,
তাদের বিক্ষিপ্ত শব্দ। অসম্পৃক্ত পদধ্বনি,
অনেক হেঁটেছে। বুকের হাড় জ্বলে গেল;
না না কিছুই পায় নি ভালোবেসে।

ক্লান্তি ক্লান্তি ক্লান্তি ভয় বুকে ভয় ঘুম অন্ধকার···
হাওয়ার মর্মর···বাতাসে তুষার···বাইরে দীর্ঘশ্বাস···
কার দীর্ঘশ্বাস দরজায় মাথা রেখে ঘুমিয়ে আছে
বাইরে কার দীর্ঘশ্বাস প্রেতের মত হাহাকার
কার দীর্ঘশ্বাস দুঃখের পাহাড়···

সম্রাট সম্পর্কী

তাহলে আবার সব ভেঙে যাবে,
ছত্রাকার হবে সব ঘর,
পুকুর, উঠোন;
যা কিছু কুড়িয়ে এনে কোন মতে করেছি সম্বল,
সে এখন বিপুল সাম্রাজ্য;
ঈশ্বর পারে না ছুঁতে, ঈশ্বরের অজেয় সম্রাট।

তাহলে আবার সব ছত্রাকার
ভেঙে যাবে,
সারারাত অন্ধকার হাওয়া ;

আবার হারাতে অনিচ্ছুক,
থাক, আর ডেকো না, ভেঙো না ভোরের ঘুম ;
সারারাত ঘুমোবার পরে যে ঘুম,
সব ক্ষুধা, যন্ত্রণার পরে যে ঘুম,
অরণ্যে কাঁটায় পুষ্পে জড়ানো যে ঘুম,
সে নিদ্রা সম্পন্ন থাক, আহত কোরো না ।
ভেঙো না ভোরের সাম্রাজ্য ।
প্রলুব্ধ কোরো না পুনরায়,
নহে ছত্রাকার
যে মুকুট শিরে নিয়ে হয়ে আছি পরম সম্রাট ।

ক্ষমা করে

কোথায় যে কবে কার কথা মনে
নাড়া দিয়েছিল সঙ্গোপনে ;
কোথায় যে কবে কে ছিল আমার
স্বর্গের সুখ, সব অধিকার ;
মনে পড়ছে না, মনে পড়ছে না কি করে যে কার
তিল তিল করে বুকে রাখলাম বিচ্ছেদ-ভার,
কি করে যে কাকে ভুলতে হয়েছে প্রতি সন্ধ্যায়
গভীর রাত্রে অন্ধকারে গোপন হাওয়ায় ,
মনে পড়ছে না, মনে পড়ছে না ;
আজো যদি তাঁর কিছু মনে পড়ে,
সে যেন আমায় বিস্মৃতি দিয়ে সব ক্ষমা করে,
সব ক্ষমা করে ।

বন্ধু কোনখানে নেই

শ্রীযুক্ত অরুণ ভট্টাচার্য

শ্রদ্ধাস্পদেষু

ঈশ্বরের সঙ্গে সংলাপ

(আসামের ভ্রাতৃহত্যা ও পাশবিকতা স্মরণ রেখে)

ঈশ্বরটি রসিক বটে দু'চোখ বুজে আছেন ন্যাকাশশী,
কিংবা ভাবেন অহিংসাতে সারা ভারত হবেন বারাণসী

ফুল ফোটেনি ওদের গাছে, পুজোয় তো চাই যা হোক কিছু অর্ঘ,
কয়টি প্রাণের বিনিময়েই ওদের হলো ভিত স্থাপনা : বর্বরতার স্বর্গ।
কাষ্ঠ কোথায় যজ্ঞ হবে ?
অর্ঘ হলাম ওদের দেশভক্তে,
ওরা আমার এতোকালের ঘরগুলিকে জ্বালিয়ে দিল,
ভিজিয়ে দিল নদী আমার রক্তে,
রক্ত ছোটে ফিন্‌কি দিয়ে, আকাশ কাঁপে, বাতাস কাঁপে ;
ওদের চোখে বিষাক্ত নিশ্বাস,
ওদের চোখে অট্টহাসি, দন্তে নখে আমার সর্বনাশ।

এই তো সেদিন বাঙলা দেশে যজ্ঞ হলো বিপুল উৎসাহতে
আবার কেন নৃশংসতায় ভাসাও দেহ রক্ত-নদী-স্রোতে।
গোঁফ নাড়ে কে আড়াল থেকে বৃদ্ধ পেচক গলিত নখ নিয়ে,
আমরা এবার ভিত গাঁথবো ওই পচা হাড় দিয়ে।
ওদের এবার চিনে নিলাম এতোকালের রঙ্গমঞ্চ মুখ।
তবু আবার বাঁচতে হবে তাদের নিয়ে নতুন প্রাণে আসছে যে উৎসুখ
তাদের নিয়েই থাকব আমি, এই আমাদের আজন্ম সংসার।
হে ঈশ্বর, আর্শি ভেঙে কী মুখ দেখো ?
নিজেরই মুখ করেছ চুরমার।

গর্দভের চোখে

গর্দভ ঈশ্বর নয়, গর্দভ স্বর্গেও ঘাস খায়, মরা ঘাস।

রাত হলেই লোকটা কেন যে অমন হয়ে ওঠে।
কিছু দেখলেই কেন যে সমস্ত শরীরে
লকলকিয়ে ওঠে সাপের মত,
ঘরে যার অমন রূপসী স্ত্রী।
যার মুখ কোনদিন কল্পনাও করতে পারেনি,
অমন রূপসী বৌ যার
ঘরে, তার দুঃখ কিসের।
অমন সুন্দরী স্ত্রীকে ভালোবেসে
ইহকাল পরকাল সব দেয়া যায় মুক্ত করে।
অমন রূপসী স্ত্রীতে মুলোটা ডুবিয়ে তবু কেন যে গর্দভ,-
কেন যে অন্যত্র পরিতৃপ্তি খোঁজে,
স্বপ্ন দেখে বীভৎস, মৃত্যুর ;
অমন স্বর্গেও আহা ক্লান্ত হয়!
গর্দভ ঈশ্বর নয়, গর্দভ স্বর্গেও ঘাস চাটে, মরা ঘাস।

২

সুন্দরও অসহ্য হয় তীব্র হ'লে ;
সুন্দর উন্মুক্ত এসো অন্ধকারে,
তারপর সমুদ্র, সাঁতার।
লোনা জলে ক্ষয়ে যাব। ক্ষয়ে যাব।
সম্পূর্ণ ক্ষয়িত হতে দুঃখ নেই।
অমন রূপসী বৌ যার
ঘরে তার কী ভীষণ যন্ত্রণা প্রবাহ।

আবিষ্কার

চুল পাকিয়ে পাকিয়ে অবশেষে আবিষ্কার করলো
ইঁদুর ।
একটা ভয়ানক দুশ্চরিত্র ইঁদুরকে আবিষ্কার করলো
তার স্ত্রীর মধ্যে । পুত্র-কন্যায়,
বড় সাহেব, স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ।
কেউ আর বন্ধু নয়, সকলেই আশ্চর্য ইঁদুর ।

চৌদ্দপুরুষের উত্তেজনা ক্ষেপে উঠলো রক্তে-রক্তে :
রাতদিন একটা খাঁচা নিয়ে,
একটা প্রকাণ্ড লোহার খাঁচার সামনে
ঝিমন্ত বেড়ালের ভঙ্গিতে লেজ গুটিয়ে চোখ উল্টে বসে থাকেন
ন্যাকা ঈশ্বরের মত ;
আসলে পেটটা মদের পিপেয় টলমল ।
খাঁচার মধ্যে পরিপাটি নারকেলের নাড়ু,
নতুন গুড়ের গন্ধ । যুবতীর ক্ষুধার্ত যন্ত্রণা ।
সেই যন্ত্রণায় চৌদ্দপুরুষ কিলবিলিয়ে উঠলো খাঁচার চারপাশে—
সবাই ইঁদুর, ঢুকঢুক করবে, সে জানে ।

অসংখ্য ইঁদুর দূর থেকে পরস্ত্রীর গন্ধ শুঁকছে বাতাসে নাক রেখে,
সে জানে ।
চতুর্দিকে ইঁদুর, ইঁদুর, ইঁদুর । ভয়ানক ধেড়ে ।
নেংটি লেজে লেজে, কিলবিল, বীভৎস উৎপাত ।
অথচ খাঁচাটা তেমনি শূন্য । অসহায় ঝিমন্ত প্রহরী ।

২
ইদানীং খেঁদী পেঁচী প্রত্যেকেই নৃত্য করে ইন্দ্রের সভায়,
প্রত্যেকেই উর্বশী ইন্দ্রাণী চন্দ্রকলা মেনকা সুন্দরী ।
কানা খোঁড়া হারামজাদা সকলেই বেঞ্চি ঠেসে ইন্দ্র হয়ে আছে ;
পরস্ত্রীদের সভা । পরস্ত্রীরা এত যে রূপসী হয় জানেনি তা আগে

উপস্থিত ভোজ সভায় আমন্ত্রিত সকল ইঁদুর।
আহা রাত, মধু রাত ডুবে আছে মদের সমুদ্রে।
ইন্দ্রগণ দেয় মন নিজ নিজ গ্রাসে।

৩

সভা ভঙ্গ, ভোর হল।
অন্ধকার অপসৃত একটা ধেড়েকে ঠেলে খাঁচায় ঢুকিয়ে।
চতুর আনন্দে নিজেই সে উল্লসিত: চীৎকার:
'ওহে শুনছো, তোমরা এখানে এসো, ওহে তোমাদের আবিষ্কার
করবো এখানে,
তোমাদের প্রমাণ করবো এমনি করে,
এই দেখো
ঠিক এমনি করে—'

নারকেলের নাড়ুটা কশ বেয়ে গড়াচ্ছে কুৎসিৎ।

যে কোন লোকের মত

চাকরী করতে করতে দিনের পর দিন, বছরের পর বছর,
বড়বাবুর দিকে চোখ রেখে চলতে চলতে
এখন আর কিছুই দেখতে পাই না ওই ধুমসো হাড়িটা ছাড়া।
বড়বাবুকে খুশী করতে করতে
নিজের খুশিটুকু ভেঙে ভেঙে বড়বাবুদের খাওয়াতে খাওয়াতে
কখন ফতুর হয়ে গেছি জানতে পারি নি;
দেখলাম, আজ একটি অভ্যস্ত শামুক হয়ে আছি।
ভিক্ষে করতে করতে এখন স্পষ্ট ভিখিরী হয়ে উঠেছি।
আর লজ্জার বালাই নেই, ইজ্জত কবে কুকুরের দাঁত ছিঁড়ে নিয়েছে।
এখন যে কোন লোকের পা চাটতে পারি, কুকুর কি শয়তানের;
কারো মস্তকে পদাঘাত করতেও বিলম্ব করি না, দ্বিধা নেই,
যেমন যখন প্রয়োজন;

২

মার খেতে খেতে এখন স্পষ্ট হয়ে উঠেছি,

এখন আর অস্পষ্টতা নেই। এখন মার খাওয়াটাই অভ্যাসে পরিণত।

কাঁদতে-কাঁদতে এমন ছিঁচকাঁদুনে হয়ে গেছি,

এখন হাসতে গেলে ভয় পাই।

এখন কান্না ছাড়া আর কিছু জানি না।

পথের লোক ধরে-ধরে আমার কান্না শোনাই।

৩

নিজের মুখ দেখে তৃপ্ত হই। ভাঙা চোরা চৌদ্দপুরুষের

কলংকের পিশাচটাকে দেখে-দেখে অভ্যস্ত ছানি-পড়া চোখ দুটো;

এখন যেদিকে তাকাই আমার মুখের অংশগুলোই সবার মুখে চোখে

দেখতে পাই।

আমি আর বড়বাবু একাকার হয়ে গেছি যেখানে-সেখানে।

নিজের মুখ দেখে কখনোই আর আঁতকে উঠি না।

হে ঈশ্বর, যদি একটু আঁতকে উঠতে পারতাম!

৪

মানুষ নাকি এক সময় হাসতো, প্রাণখুলে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে

হাসতো;

একদিন মিউজিয়মে গিয়ে সেই ভয়ানক কংকালটাকে দেখে আসবো।

তারপর ডক্টর হব একটা থিসিস্ লিখে:

মানুষ কখনো হেসেছিল কিনা,

মানুষ কখনো ভালোবাসতো কিনা।

সংবাদপত্র

সমস্ত রাতভর দুঃস্বপ্নের পর

ভোর হতে না হতেই আরেক দুশ্চিন্তার ইন্ধন ছুঁড়ে দেয় জানলা দিয়ে;

শব্দের পর শব্দে শুধু ভয়ের সৃষ্টি,

কথার পর কথা সাজিয়ে শুধু আতংকের সজ্জা।

বর্বরের চীৎকার, পাষণ্ডর আস্ফালন
নিরীহ রাত্রিগুলি দুঃস্বপ্নের গুদাম হয়ে ওঠে,

সূর্যটা চেয়েছিল এক লাফে আমার ঘরে ঢুকতে ;
ভেবেছিলাম চোখ তুলে একবার দেখবো,
একবার বুক ভরে ওকে আলিঙ্গন করবো ;
কিন্তু তার আগেই সূর্যকে ঠেলে দিয়ে
আতংকের মূর্তিটা এক লাফে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে—
তারপর সমস্ত সকালটা, দিনটা কি ভয়ানক কালো করে দেয়
তিলে তিলে ।
দিনটাকে গিলে ফেললো গোগ্রাসে ।
দুঃসাহসিক ভয়ের মুঠোয় সমস্ত মুখগুলো ফ্যাকাশে কোরে তোলে
কালকেই হুকারকে নিষেধ করে দেব ।
অহেতুক বর্বরের হুংকার শুনতে রাজি নই ।
আমাকে ওরা আর ভয় দেখাতে পারবে না চোখ খুললেই ।
কখনোই নয়, ঘুমোবার আগেও না,
ঘুমের মধ্যেও না ।

ঈশ্বরের সঙ্গে দ্বন্দ্ব

আর কাউকেই অবিশ্বাস কোরো না,
কেহই বিশ্বাসের অযোগ্য নয় ;
আত্মীয় স্বজন বন্ধু ইঁদুর বেড়াল ছুঁচো
সকলেরই অন্তরে অন্তরে
জাহাজের সামুদ্রিক ভালোবাসা আছে ;
ওই গোপন গৃহের মধ্যে দুদণ্ড সময় যদি পাও
তাহলে কাউকেই আর বিশ্বাসের অযোগ্য মনে কখনো হবে না ।

তাহলে বন্ধুর যোগ্য হতে পারে অনেক বন্ধুরা ।

কোন প্রবীণ কবিকে মিনতি

চতুর চঞ্চল ধূর্ত বৃদ্ধবর প্রবীণ হরিণ
বৈশাখে ঋতুর জ্বরে বৃষ্টিভেজা কচি ঘাস খুঁজে
বাগানে হলুদ ঘাসে অনর্থক করো প্রদক্ষিণ
দু'পায়ে আবার খোঁড়ো যে-গর্ত ফেলেছি আমরা বুজে
প্রৌঢ়ত্বে মৃত্যুর গন্ধ।   অর্বাচীন বালকসুলভ
ললিত চাঞ্চল্য-সিক্ত।   বিস্ময়মুগ্ধ যুবতী বিলাসী।
শোনো, দক্ষিণ প্রদেশে সবুজ ঘাসের বনভূমি
সযত্ন রক্ষিত, যাও, তোমার সংসার বিরচিতে।

স্মৃতিমুগ্ধ কবিবর, আত্মকথা পূতিগন্ধ শশী।
এখনো আশ্বিনে রৌদ্র দেখে তুমি দাও হাততালি
আঙুলে কোঁচাটি, দেহে শতচ্ছিন্ন ঐশ্বরিক তালি
শরীরে আঙুলে ঠোঁটে যথারীতি নিরেট ন্যাকামি।
প্রসন্ন শীতের গর্ভে নিরুত্তর বসন্ত ক্রন্দসী;
আমোদিত মাছি ওড়ে নষ্টফল স্বর্গ বারাণসী।

অবশিষ্ট

হয়তো বাড়তি কিছু, তা হোক, তবুও
ক্ষুধা যদি বাইরে রেখে আসে,
নাহলে কেমন করে আবার ঘানিতে গরু হবে,
আটটা না-বাজতেই কাল ঘাড়ে তার বাঁধবে জোয়াল
তারপর, ভাঙবে দুপুর
গুড়ো গুড়ো হয়ে যাবে সমস্ত যৌবন
ক্ষয়ে যাবে পৈত্রিক ঋতুটা;

সন্ধ্যা হলে অন্ধকারে খোয়ারের বিকলাঙ্গ বৃষ
সব ক্লান্তি ধুয়ে ফেললো খড়ি ঘষা মুখের হাসিতে।
(আহা মুখ বেঁচে থাক আরো খড়ি ঘষা হয়ে আজন্ম গলিতে
কে দেখে বুকের ক্ষত খড়ি ধুয়ে দুচোখের জলে!)

হয়তো বাড়তি কিছু খরচা হলো, তা হোক, তবুও
ক্ষুধা বাইরে রেখে এলো ; দড়ির খাটিয়া
ক্লান্ত পশুটার ঘুমে মগ্ন হবে অবশিষ্ট রাতে।

দূরে থেকে ভেবেছিলাম

দূরে থেকে ভেবেছিলাম তুমি মহৎ নদী,
আকাশ তোমায় উঠতে বসতে জানাচ্ছে কুর্নিশ,
তোমার স্নেহে ধন্য খানা ডোবা।
আহা ব্যাঙ ব্যাঙাচিরা সুখে থাক স্ত্রীপুত্র-সংসারে।
কাছে এলাম, দেখি,
উদরে জল, রক্তে কালো বিষ
আহত ব্যাঙের মত রোগে বোগে ভুগছে অহর্নিশ ;

মুখে ও কিসের দাগ, শ্বেত বজ্জাতির, ঢেকে রাখো,
চোয়ালে কপালে এখনো কার জুতোর ময়লা লেগে,
মুছে ফেলো, দুঃখ পাবে নাতি, না-বালক শিশু
এখনো তোমার মত পায় নি যে সে তিক্ত সহিষ্ণুতা।

পৃথিবীতে

মানুষের কোনচিহ্ন থাকবে না আর পৃথিবীতে ;
পৃথিবী আবার ফিরে যাবে তার সমুদ্রের ক্রোড়ে ;
স্তূপাকৃত পাথরের কিংবা মৃত মানুষের ভারে
পৃথিবী কোথায় ডুবে অপসৃত হবে

মানুষ আবার তার অহংকারে হিংসায় বর্বর,
লাঞ্ছিত করেছে চতুর্দিক,
পরিণামে অন্ধকারে শুধু মানুষের নামে প্রেত প্রেতিনীরা
মানুষেরই পচা হাড় মাংস ছিঁড়ে খাবে।

মানুষ কখনো নেই, ছিল নাকি,
সব নদী বিষাক্ত এখন,
কোথাও বাতাস নেই, ছিল নাকি,
সব হাওয়া কবরে যখন
পৃথিবীর ইতিহাস এ মানুষ লিখবে না কেউ ;
এ মানুষ কোন চিহ্ন রাখবে না আর পৃথিবীতে।

আবার হাজার কোটী বছর সময় দিতে হবে
পৃথিবী কখনো যদি জন্ম দিতে চায় মানুষের ;
পুনরায় আসে যদি ফিরে এই মানুষের মাঝে।
সেদিন আবার আমি যদি আসি, যদি দেখি
সে-পৃথিবী আনন্দে উজ্জ্বল,
তাহলে আমাকে তুমি মানুষের মত জন্ম দিও।

বন্ধু কোনখানে নেই

১

বন্ধু কোনখানে নেই। চতুর্দিকে চাতুর্যের লীলা,
কখনো বুদ্বুদ দেখে জাল ফেলে বালকধীবর।
শূন্যজালে জড়ায় জঞ্জাল মৃত শামুক ঝিনুক,
সব রুটি খেয়ে যায় চতুর মাছেরা রাতে এসে।
বন্ধু কোনখানে নেই। ওরা সব পাউডার লিপ‌্স্টিক্
বৃষ্টি হলে দেখা যাবে ঠোঁটে সাদা জটিল অসুখ
যে রোগে নিস্তার নেই ; তার চেয়ে কঠিন যন্ত্রণা
তোমাকে প্রীতির নামে বুকে দেবে আমূল কৃপাণ।

ওরা চিরকাল বন্ধু, ওদের নিয়েই বাস করি!
প্রত্যহ মৃত্যুকে নিয়ে দৃশ্যে দৃশ্যে দুঃখ অহর্নিশ।
অর্থ অন্ন নানাবিধ অভাবের প্রহরায় বন্দী
তদুপরি বাল্য হতে যারা সহচর হয়েছিল
পশুর ক্ষুধিত দাঁতে তারা বিকশিত হাস্যময়।
বন্ধু কোনখানে নেই। বন্ধু ওই আজন্ম শ্বাপদ।

২

বন্ধু কোনখানে নেই। অটল বিশ্বাস ত্যাখো কাঁপছে
ওই ক্ষুদ্র কম্পমান সবুজ পাতায়; এক ফোঁটা
আনন্দের মতো ভাগ্য নিয়ে। কখন হাওয়ার হাতে
উল্টে যাবে আবার মাটিতে অদৃশ্যে মিলিয়ে যাবে
ভালোবাসা সুখ প্রীতি আনন্দ সঙ্গীত মুক্তধারা;—
ওরা সব কেড়ে নিল, আজন্ম দুর্লভ ধন,—হায়,
নিবিড় বিশ্বাসটুকু যা ছিল একান্ত আপনার;
ওরা ছদ্মবেশে আসে, চিনতে পারি, তবুও দুহাত
বাড়াই ওদের দিকে, যদি ক্ষমা করতে পারি, তবে,
হয়তো বলতে পারি—আবার, বাগানে ফুল হবে,
এই ভেবে খুশী হব। এই ভেবে আনন্দিত হব,
প্রত্যহের ছলনায় আবার বাঁচব অভিনব।

হে ঈশ্বর, শৈশবের দুর্লভ ঘরটি যদি পাই
তাহলে সদম্ভে বলি কে বলে আমার বন্ধু নাই।

৩

বিশ্বাস বুদ্বুদ হয়ে ফেটে গেল সমুদ্রে সমুদ্রে,
চতুর্দিকে প্রতিধ্বনি বিশ্বাসের মৃতদেহ নিয়ে।
তাদের কেমন করে আবার, আবার কাছে ডাকি,
বন্ধুর আসন পেতে সহৃদয়ে অপেক্ষায় থাকি!

বাল্য হতে যারা ছিল সহচর অনঙ্গ বান্ধব,
তাদেরি আত্মীয় জেনে, হাতে হাত রেখে এই ঘরে
এসেছি নির্ভয় নিয়ে, বুকে তৃষ্ণা দুর্লভ সন্ধানে
: সদর্প যৌবন স্পর্দ্ধা বজ্রমুষ্টি স্বর্গ বিজয়ের।

তারা সব কোথায় লুকালো কোন পাথরের মোহে,
কোথায় আশ্চর্য ফল পেকে আছে অমৃত গৌরবে
তার-ই মোহে চলে গেল, আমি একা নির্বান্ধব গৃহে
চলচ্চিত্রে দেখি এই সহরের রেস্তোরাঁ কেবিনে
সমবেত যুবকেরা উল্লসিত বন্ধু-নিকেতনে ;
আহা ওরা প্রীত হোক, বেঁচে থাক মুহূর্তের সুখে।

৪

এরা হাসি মুখে আসে, মুখে চোখে রঙিন সৌরভ।
এদেরি লালন করি অনভ্যস্ত ঐশ্বরিক হাতে।
তোমাদের থেকে যত দূরে থাকি ততই মঙ্গল,
এ হেন দুর্লভ প্রীতি, এইসব প্রসন্ন হাসিতে
দেখি শত বিষধর সর্পের অমৃত আলিঙ্গন।
তোমরাই প্রীতির স্বর্গ। এক এক জন মূর্ত পঞ্চশর :
কী পেলে যে খুশী তোমরা, সে সংবাদ ঈশ্বর-অজ্ঞাত।
হে ঈশ্বর, এই সব বালকেরে ক্ষমা কোরো তুমি।

ওরা ভালোবাসে শুধু নরম মাংসই ছিঁড়ে খেতে,
শকুনের মত ওরা খোঁজে পচা কুকুরের দেহ।
চিরকাল যৌবনের আজন্ম ইচ্ছার ঋতুটিকে
ওরা ছিঁড়ে কুটি কুটি করে দেয় স্বার্থের আঘাতে।

ওদের প্রেমের স্বাদে পচা ইঁদুরের গন্ধ পাই
হে ঈশ্বর, এই সব বন্ধুদের ক্ষমা কোরো তুমি।

চার বন্ধুর ফটো দেখে

আমি জানি। ওই ফটোর রহস্য সব জানি।
জেনেছি, মহৎ কতখানি, কত অন্তরঙ্গ ওরা, জানি।
ওদের নিবিড় প্রীতি, আত্মীয়তা, জেনেছি সকলি।
তোমরা তো দেখেছ, ওরা প্রত্যহ নিবিড় আলিঙ্গনে
বুকে বুক ছুঁয়ে পথ চলে।
ওরা পরস্পর বন্ধু-জন।

ওসব কিছুই নয়। অন্তরঙ্গ, গলাগলি, আত্মীয়তা ভালোবাসাবাসি-
ও সব কিছুই নয়। ও-যে বন্ধু-বন্ধু খেলা,
আসলে বন্ধুই নয়। ওরা ভিন্ন পথের নায়ক।
ওরা ভিন্ন চিন্তার পথিক।
ওদের নিবিড় দেখে খুশি হই, মনে মনে বলি,
সুখী হোক, বন্ধুত্ব অমর হোক।
এমন নিবিড় বন্ধু, বন্ধুত্ব হয় না।
ওরা চার বন্ধু একাসনে,
ওরা চার বন্ধু পরস্পর।
অথচ ওদের বুকে দুঃখ কেন, কেন এত দুঃখ জমে ওঠে,
ওরা দুঃখ পায় পরস্পর
আমি জানি, ওই ফটোর রহস্য সব জানি।
মনে মনে ওরা বড় একা। নিঃসঙ্গ পাখির মত আকাশে-আকাশে,
একা, একা। একা সমুদ্রের মত উত্তাল তরঙ্গ নিয়ে বেঁচে আছে,
বুকে বিহঙ্গের ছায়া কাঁপে,
বিচিত্র শরীরে ছায়া কাঁপে।
বিচিত্র রহস্য ওই ফটোর আড়ালে।
জানি, সব জানি,
ওরা কেউ বন্ধু নয়, শুধু বন্ধু হওয়ার আনন্দ ফ্রেমে বাঁধা।
ঘনিষ্ট বন্ধুর মত চারটি পুতুল পাশাপাশি।

অমৃত অধিকার

বন্ধুদের বন্ধু হ'তে বলেছিলাম। বলেছিলাম, এসো সগৌরবে
আমরা সবাই মহৎ হব। পরস্পরে প্রীতির মালা রচি।
বন্ধু হব। বন্ধু পাব। দুর্নিবার এই কলহ সংকটে।
ওরা সবাই নীরবে হাসছিল।
ওরা আমায় সরিয়ে দিল অন্ধকারে দূরে।
ওদের প্রবঞ্চনার হাসি, চমক তোলে আহত সত্তায়,
অনুভূতির বালাই ঘুচে গেছে অনেক আগে।
এখন শুধু গড্ডলিকায়, প্রগলভতায় মত্ত দলাদলি,
অন্ধকারের সঙ্গী হব, করব গলাগলি।
বলেছিলাম এসো, সগৌরবে,
বন্ধু হব। বন্ধু পাব দুঃসময়ে কলহ সংকটে।
ওরা আমায় ফিরিয়ে দিল সহাস্য কৌতুকে।
দুঃখ আমার সঙ্গী হলো বুকে।

অমৃতস্য পুত্রাঃ

সবি তোমার প্রতারণা, হে ঈশ্বর, মিথ্যা প্রাণের অঙ্গিকারে
ভরিয়ে দিলে আকাশমাটি কী যন্ত্রণায় হাহাকারে;
আমরা ভীতু প্রাণের দায়ে তোমার পায়ে লুটিয়ে পড়ি মুহূর্ত নিশ্বাসে,
আমরা তোমার বাঁধা ছাগল মুখ রেখেছি শুকনো খড় ঘাসে,
আমরা কুকুরকুণ্ডলী দেই, লেজ নাড়ছি তোমার পায়ে পায়ে ;
সান্ত্বনা দেই :
এ সর্বনাশ কর্মফলের দায়ে।
ভণ্ড সাধু হে সন্ন্যাসী, সইব না আর তোমার প্রতারণা,
মন্দিরে আর যাচ্ছি নাহে, থাক্ তোলা আজ
তোমাকে বন্দনা।

আর হবে না অন্ধকারে হে ঈশ্বর, তোমায় মিথ্যে খোঁজা,
ধৃতরাষ্ট্র রাজা হলেন, আমরা প্রেমিক, কবি ;
পরমেশ্বর ত্রিকালজ্ঞ খোজা।

উৎসব

আবার মৃত্যুর গল্প সনাতন সাবেকি মেজাজে
ইনিয়ে-বিনিয়ে বলা দৃপ্ত দার্শনিক প্রথামত :
সংকোচে জীবন কথা বলে মুহ্যমান বক্তা গ্রাসে
জল খান ; নেহাৎ অভ্যাস বসে সৌজন্য প্রকাশ।
উচ্চকিত অনুগত বালক-বালিকা আনন্দিত,
মুখর গুঞ্জন ধ্বনি : ধন্য ধন্য অমৃত ভাষণ।
নিরুত্তর ভক্তাসক্ত মুগ্ধবক্তা নীরবে হাসেন।
ভাগ্যিস কবির মৃত্যু অকস্মাৎ হল কাল রাতে।

আবার প্রকাশ্য মৃত্যু সাড়ম্বর উৎসবে কবির।
দেখলাম সবান্ধবে কবিকে হিঁচড়ে টেনে আনা
রঙিন পটের বুকে যুবকের দীপ্র ভঙ্গি আঁকা
চারিদিকে গুঞ্জরণ টাটকা শব্দের ঘনঘটা
যে যার ব্যঞ্জনা নিয়ে মঞ্চে ঘন ব্যস্ত ঘোরাঘুরি।
এ সব মৃত্যুকে জয় করে কবি হলো মৃত্যুঞ্জয়।

বৃক্ষ

একটি পত্রও তোর ছিঁড়তে পারবে না দস্যু হাওয়া।
যতই ভীষণ হোক উত্তরের ক্ষুধার্ত বাতাস।
যতই বর্বর হোক হিংসুক উন্মত্ত ও বাতাস,
একটি পত্রও তোর ছিঁড়তে দেব না কারো হাতে।

আমার রক্তের কণা তোর প্রতি পত্রের শিরায় প্রবাহিত
ভুলে গেছি ?

তোর প্রতি পুষ্প ফলে শিকড়ে শিকড়ে
পিতৃপুরুষের রক্ত এখনো উত্তপ্ত হয়ে,—
ভুলে গেছি ?

একটি পত্রও তোর ছিঁড়তে দেব না কারো হাতে।

২

দেব না বিকৃত হতে তোর মুখ। তোর দেহপদ্ম হতে
একটি পাপড়ি ওকে খশাতে দেব না।
দেব না বিকৃত হতে তোর এ শরীর ; যার স্তনে
পালিত হয়েছি এতকাল ; তার ঋণ
চিরকাল রক্তে রক্তে দেনা ;

দেব না লুণ্ঠিত হতে দস্যুর মুঠোয় এই মাটি,
সবুজ দূর্বাও নয়। দেব না ছিনিয়ে নিতে
যতক্ষণ এই রক্ত প্রবাহিত
যতক্ষণ এ হাত মুঠোয় দৃঢ় হতে পারে
ততক্ষণ কারো হাতে দেব না লাঞ্ছিত হতে তোকে